

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। বর্ণবাদের ভিত্তিতে দেশ ভাগের পর বাঙালি বুঝতে পারে এ দেশ আমার নয়, এ স্বাধীনতাও আমার নয়। কোন সমাজ বা জাতিরাষ্ট্র নয়

ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রতিনিয়ত শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হচ্ছে। এই বাঙালি উপত্যকার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আত্মসম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। যাইহোক, পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন মূলত 1966 সালে 6-দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রশ্নে পরিণত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে বাঙালির মুক্তি সনদে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু তৎকালীন কিছু প্রগতিশীল বাম রাজনীতিবিদ ETA কে CIA নথি বলে অভিহিত করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান 1979 সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন এবং 6-দফা বাঙালি মুক্তির সনদ প্রতিষ্ঠা করেন। আর তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দিনটি ছিল ৭ জুন ১৯৬৬। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটি এক অনন্য আত্মত্যাগের প্রতিবাদে গৌরবময় সংগ্রামের দিন। ১৯৬৬ সালের ১৩ মে পল্টনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় ৭ জুন হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জুন জুড়ে ৬ দফা প্রচারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

গত ৭ জুন তেজগাঁওয়ে ধর্মঘটের সময় মনু মিয়া নামে এক বেঙ্গল বেভারেজ শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে প্রতিবাদের তীব্রতা বেড়ে যায়। তেজগাঁও যাওয়ার ট্রেন থামল। ইপিআরের গুলিতে আজাদ এনামেল অ্যালুমিনিয়াম কারখানার শ্রমিক আবুল হোসেন শহীদ হন। একই দিন নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনের কাছে পুলিশের গুলিতে ছয় শ্রমিক শহীদ হন। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সন্ধ্যায় কারফিউ জারি করা হয়। হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়। অনেক জায়গায় জনতা গ্রেফতারকৃতদের ধরে ফেলে। ৬ দফা আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শহীদের রক্তে যোগ হয় আন্দোলনের নতুন মাত্রা। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সারাদেশের শ্রমিক, কৃষক, জনসাধারণকে সংগঠিত করতে মাঠে নামেন।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফা আন্দোলন ছিল দেশের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গৌরবময় অধ্যায় হল ৬-দফা আন্দোলনের নেতৃত্ব, যা তাঁকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির একমাত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতাক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আন্দোলনের তুঙ্গে ছাত্রসমাজ বাঙালি জাতির পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে অভিষিক্ত করে এবং বাঙালি জাতি বিনা দ্বিধায় স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু উপাধি গ্রহণ করে।

লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। তারা নিম্নরূপ ছিল:

প্রস্তাবনা-১: রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো এবং প্রকৃতি: দেশের সাংবিধানিক কাঠামো এমন হওয়া উচিত যাতে পাকিস্তান হবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি ফেডারেটেড রাষ্ট্র। সরকার হবে সংসদীয় টাইপের। আইন পরিষদের ক্ষমতা সার্বভৌম হবে এবং এই পরিষদও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

প্রস্তাবনা-২: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা: কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) এর ক্ষমতা

সরকার শুধু দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে যথা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি। অন্যান্য সকল বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হবে।

প্রস্তাবনা-৩: মুদ্রা বা আর্থিক ক্ষমতা: মুদ্রার বিষয়ে, নিম্নলিখিত দুটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণ করা যেতে পারে: (ক) দুটি পৃথক কিন্তু সম্পূর্ণ দেশের জন্য অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা। অথবা (খ) বিদ্যমান নিয়মের অধীনে সমগ্র দেশের জন্য শুধুমাত্র একটি মুদ্রা কার্যকর হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থায় একটি কার্যকর ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি পাচারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভও স্থাপন করা উচিত এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক আর্থিক বা মুদ্রানীতি চালু করা উচিত।

প্রস্তাবনা-৪: রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্পর্কিত ক্ষমতা: ফেডারেশনের রাজ্যগুলির কর বা শুল্ক আরোপের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর আরোপের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর জন্য রাজ্যের রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল রাজ্যগুলি দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত ধরণের করের সমান শতাংশ নিয়ে গঠিত হবে।

প্রস্তাবনা 5: বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষমতা: (ক) ফেডারেশনের প্রতিটি রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। (b) বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যগুলির এখতিয়ারের অধীনে থাকবে। (c) কেন্দ্রের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা সদস্য রাষ্ট্রগুলি একই হারে বা সম্মত যে কোনও হারে পূরণ করবে। (d) সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পণ্য চলাচলের উপর কোন শুল্ক বা ট্যাক্স সীমাবদ্ধতা থাকবে না। (ঙ)

শাসনব্যবস্থার উচিত সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের বিদেশে পাঠাতে এবং তাদের স্বার্থে বাণিজ্য চুক্তি করার ক্ষমতা দেওয়া।

প্রস্তাবনা 6: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা: আঞ্চলিক ঐক্য ও শাসন রক্ষার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের এখতিয়ারের অধীনে আধাসামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা দিতে হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ জুনের আন্দোলনে মনু মিয়া ও অন্যান্য শহীদদের রক্তে রাঙানো রাজপথের দিক সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হন এবং তাঁর একনিষ্ঠ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের ৬-দফা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। ফলস্বরূপ, পাকিস্তানি জাভা ঘোষিত আইনি কাঠামোর (এলএফও) অধীনে মুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীকে একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পরে পাকিস্তানি সামরিক জাভা সংসদ অধিবেশন আহ্বান করে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জাভা জনগণের রায়কে পদদলিত করে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষায় বাঙালিদের ওপর নিপীড়নের স্টিমরোলার চালাতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান একটি দাবানলে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ একটি স্বাধীন বাঙালি মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে নিয়েছিল।

২শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' অনুমোদন দেন। ঐতিহাসিক রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু বক্তৃকণ্ঠে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক জাভা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা করে। আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দেন।

ঐতিহাসিক ৭ই জুন বাঙালি জাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে কোনো আন্দোলন বা সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজপথ উত্তপ্ত ও শহীদদের রক্তে রঞ্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো আন্দোলন সফল হয়নি এবং নয়। জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, প্রগতিশীল মানবতাবাদী জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আমরা সেই পথ থেকে সরে এসেছি। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে আমরা নামমাত্র গণতন্ত্র অর্জন করেছি। এখনো আমরা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারিনি। আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনি। এর কারণে আমাদের নির্বাচন বারবার প্রলম্বিত হয় এবং অন্যান্য রাজ্যের স্তম্ভে হামলা হয়। এখন যখন ৭ই জুন পালিত হয়, তখন ৭ই জুনের এই ঐতিহ্যে দেখা যায়, এবার আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, চীন, স্পেন, ইতালির মতো উন্নত দেশগুলো প্রায় সঙ্কটে পড়েছে। ছোট রাজ্যগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আমাদের প্রতিবেশী ভারতও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। করোনা আমাদেরও আঘাত করেছে! অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে, এবং সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে!

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যদি নতুন বিশ্বকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা ভাবি বা ৭ জুনের শহীদদের আত্মত্যাগের কথা ভাবি, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে হীনম্মন্যতা, ধর্মাত্মতা দিয়ে মোকাবিলা করতে পারব না। বা অহংবোধ। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের চিন্তা-চেতনার শক্তি যাদের আছে, প্রগতিশীল শক্তি আছে, তাদের ভাবতে হবে আগামীর ভবিষ্যৎ নিয়ে, ভবিষ্যতের পৃথিবী নিয়ে। শুধু দেশ নয় ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে। তাই এ বছরের ৭ জুন আসুন আমরা সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর চিন্তাধারার শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রামে এগিয়ে যাই।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলনের তাৎপর্য

ছয় দফা দাবি আমাদের ইতিহাসের ইতিহাসে একটি অনন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে এবং এইভাবে বাংলাদেশের একটি মাইলফলক ঘটনা।

এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের আহ্বান জানিয়েছিল। আন্দোলনের মূল এজেন্ডা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের শোষণের অবসান ঘটাতে ১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর একটি জোট কর্তৃক পেশ করা ছয়টি দাবি আদায় করা। এটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ভারত ভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তানের (পরবর্তীতে বাংলাদেশ) অধিবাসীরা এর জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে রপ্তানি (যেমন পাট ইত্যাদি) ছিল পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ। যাইহোক, পূর্ব পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিধার আনুপাতিক অংশ ছিল না।

বছরের পর বছর আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান একটি সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। ফলে ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের জন্ম দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা এই বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা উল্লেখ করা হলো:

১. সংবিধানে লাহোর রেজোলিউশনের ভিত্তিতে প্রকৃত অর্থে পাকিস্তানের একটি ফেডারেশন এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত আইনসভার আধিপত্য সহ সংসদীয় সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা উচিত।

২. ফেডারেল সরকারের শুধুমাত্র দুটি বিষয়ের সাথে মোকাবিলা করা উচিত: প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক, এবং অন্যান্য সমস্ত অবশিষ্ট বিষয়গুলি ফেডারেটিং রাজ্যগুলিতে ন্যস্ত করা উচিত।

৩. দুটি উইংয়ের জন্য দুটি পৃথক, কিন্তু অবাধে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা চালু করা উচিত; অথবা যদি এটি সম্ভব না হয় তবে সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রা থাকা উচিত, তবে কার্যকর সাংবিধানিক

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির ফ্লাইট বন্ধ করার বিধান চালু করতে হবে। উপরন্তু, একটি পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ স্থাপন করা উচিত এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রাজস্ব ও আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত।

4. কর ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা ফেডারেটিং ইউনিটের উপর ন্যস্ত করা উচিত এবং ফেডারেল কেন্দ্রের এই ধরনের কোন ক্ষমতা থাকবে না। ফেডারেশন তার ব্যয় মেটাতে রাজ্যের করের অংশের অধিকারী হবে।

5. দুটি শাখার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য দুটি পৃথক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে; ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দুটি উইং দ্বারা সমানভাবে বা একটি অনুপাতে স্থির করা উচিত; দেশীয় পণ্য দুটি শাখার মধ্যে শুল্কমুক্তভাবে চলাচল করা উচিত এবং সংবিধানের ইউনিটগুলিকে বিদেশী দেশের সাথে বাণিজ্য সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

6. পূর্ব পাকিস্তানের একটি পৃথক সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনী থাকা উচিত এবং নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে হওয়া উচিত।

প্রস্তাবটি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অ-আওয়ামী লীগ রাজনীতিবিদরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা প্রত্যাখ্যান করেছেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নাসারুল্লাহ খান। এটি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং নেজাম-ই-ইসলামও প্রত্যাখ্যান করেছিল। যাইহোক, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে এই আন্দোলনের জোরালো সমর্থন ছিল।

মুজিব, যিনি তিন বছর পর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হতে পারবেন না, 1966 সালের 8 মে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিধির অধীনে বন্দী হয়েছিলেন। কারণটি বোঝা কঠিন ছিল না: পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান তার মতামত পরিষ্কার করেছিলেন। ছয় দফার উপর। তিনি দেশকে বলেন, ছয় দফার উদ্বেগকারীদের সঙ্গে অস্ত্রের ভাষায় মোকাবেলা করা হবে।

আইয়ুব খানই একমাত্র ব্যক্তি নন যিনি ছয় দফা স্বীকার করলে পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার শীঘ্রই বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ছয় দফা নিয়ে ঢাকার পল্টন ময়দানে একটি প্রকাশ্য বিতর্কে মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করেন। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদই মুজিবের পক্ষে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে ভুট্টো আসেননি।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর নেতারা তাসখন্দ-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রবণতা নিরূপণের জন্য ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে ৪ ফেব্রুয়ারি লাহোরে পৌঁছান এবং পরের দিন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি হিসাবে বিষয় কমিটির সামনে ছয় দফা দাবি সনদ পেশ করেন। সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে তার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। বিষয় কমিটি বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

পরের দিন, পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রে ছয় দফা কর্মসূচী নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ফলে শেখ মুজিব সম্মেলন ত্যাগ করেন। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দাবি আদায়ে আন্দোলনের প্রস্তাবসহ ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করা হয় এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।

কেন ছয় দফা কর্মসূচিকে বলা হয়- “বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সনদ”?

1947 থেকে 1971 পর্যন্ত, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি ঐতিহাসিক সময় ছিল এমন একটি সময় যা এই অঞ্চলে অনেক বেদনাদায়ক ঘটনার সাক্ষী ছিল।

বিষয়গুলো ছিল স্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং সবচেয়ে বড় কথা ছিল বাঙালিদের অনুভূতির সঙ্গে সত্যিকারের মিল। এই প্রথম বাঙালি চিংকার করেছিল, তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং জাতীয় নিরাপত্তা চেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ছিল বরং বেদনাদায়ক এবং অপমানজনক। এটি এমন একটি ঘটনা যা বাস্তবতাকে নিশ্চিত করেছিল যে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ ছিল।

৭ জুন ১৯৬৬ বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি লাল অক্ষরের দিন। এই ঐতিহাসিক দিনেই এদেশের সংগ্রামী মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের দৃঢ় ও দৃঢ় ব্রত নিয়েছিল।

তাই দিনটির রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। এই দিনে আরও একবার, আমাদের জনগণের শিরা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল যখন তারা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবির বিখ্যাত সনদের মাধ্যমে তাদের স্বশাসনের দাবি করেছিল যা শেষ পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনের ম্যাগনা কার্টা হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের মাটি। সুতরাং, এই ঐতিহাসিক দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য খুব কমই বলা যায়।

বহু আগে থেকে শুরু হওয়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখতে পাব যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর জনগণকে ক্রমান্বয়ে ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তির চূড়ান্ত পথে নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি দিয়েছিলেন। 16 ফেব্রুয়ারী, 1966 তারিখে লাহোরে তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের একটি জাতীয় সম্মেলনে জাতি।

বঙ্গবন্ধুর এই কর্মসূচী ইসলামাবাদের শাসকচক্রকে পরিকল্পিত শোষণের সমস্ত কৌশলে বিপর্যস্ত করেছিল এবং তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে সহিংস ঝড় তুলেছিল।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর ম্যাগনা কার্টায় যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই সময়ের পঁচাত্তর কোটি মানুষের উত্থাপিত আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে দমন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। ছয় দফা কর্মসূচির ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুকে তার অন্যান্য অনুসারীসহ ৮ মে ১৯৬৬ সালে কারাগারে পাঠানো হয়। বঙ্গবন্ধু ও তার অনুসারীদের গ্রেপ্তারে জনগণ তীব্রভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এবং সারা বাংলাদেশ সভা, সমাবেশ এবং মিছিল করে এক সত্তার মতো প্রতিবাদ করেছিল যা দূরবর্তী রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে কঁপে উঠেছিল।

20 মে, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি দমন-পীড়নের নিন্দা জানিয়ে এবং বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এভাবে ৭ জুন হরতাল পালন করা হয়। দিনটি শুরু হয়েছিল কলকারখানা বন্ধ, সড়ক পরিবহন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার মধ্য দিয়ে। এভাবেই জনগণ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিল এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন করেছিল।

লোকজন তাদের প্রতিষ্ঠান, অফিস, দোকানপাট বন্ধ করে রাস্তায় নেমে আসে। তারা তাদের স্বাভাবিক সকল কার্যক্রম স্থগিত করেছে। মিছিল আর স্লোগানের নগরীতে পরিণত হয় ঢাকা। শ্রমিক-শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে। কিন্তু শোষণ শাসন তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের পবিত্র শপথ গ্রহণকারী স্লোগানবাজদের সহ্য করতে পারেনি এবং তাই শাসকচক্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে মনু মিয়াসহ অসংখ্য মানুষকে অস্ত্রের মুখে হত্যা করেছে। এভাবে রক্ত ঝরিয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার স্লোগান দেয়।

গান এখানেই শেষ হয়নি; সুর স্থির থাকে...প্রতিটি গৌরবের একটি মূল্য দিতে হয়। স্বাধীনতার জন্য বাঙালিদের চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একত্রিত করেছিল। এটা ছিল বাঙালিদের জন্য সত্যের মুহূর্ত যখন তারা সবাই একজোট হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য হাত মিলিয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর চোখে তারা আর শুধু বাদামী মানুষ ছিল না; পরিবর্তে, তারা ফিরে যুদ্ধ করে এবং তাদের বিজয় লাভ করে।

অবশেষে, পাকিস্তানের বর্বর সামরিক শাসকদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম হয়।

এত বড় মানুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু, তিনি হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত জনক। এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা নিছক অজ্ঞতা। এটা অস্বীকার করা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ।

আর এটাই গর্ব ও গৌরব এবং পাকিস্তানের সাথে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

লেখক একজন স্বাধীন রাজনৈতিক বিশ্লেষক যিনি রাজনীতি, রাজনৈতিক এবং মানব-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং বর্তমান ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে লেখেন।